Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 30–34
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ব্যাঘ্র দেবতা ও কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্য

শুকদেব ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
SACT, বাংলা বিভাগ, কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল : sukdevghosh7@gmail.com

Keyword
মঙ্গলকাব্য, ব্যাঘ্রদেবতা, রায়মঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাস, দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী, কালু রায়, বনবিবি।

Abstract
বাঘের উপদ্রব বঙ্গদেশে, বর্তমান সময়ে বিশেষ করে সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে দেখা যায়। এলাকার মানুষ বাঘ কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে জীবন যাপন করে থাকে। আর প্রতিনিয়ত প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেতে ভরসা যোগান ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়, বড়খা গাজী বনবিবি, কালুরাই প্রভৃতি দেবদেবীরা। এইসব দেবদেবীদের স্তুতি করে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, একাধিক পালা গান। দক্ষিণ রায়কে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের যে কাব্যধারার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম- রায়মঙ্গল। কবি কৃষ্ণরাম দাস, হরিদেব ও রুদ্রদেব- এই তিনজন কবি রায়মঙ্গল রচনা করেন। তার মধ্যে কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গল কাব্য ধারার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি।

Discussion
সভ্যতা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মানব সমাজের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে সে সম্পর্ক অনুপস্থিত।কারণ অতীতের অরণ্যচারী মানুষের প্রতিবেশি ছিল একাধিক হিংস্র জীবজন্তু। ফলে আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষ এসব হিংস্র জীবজন্তুর পূজা শুরু করে। পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পশুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বাঁধনও আলগা হতে শুরু করলে মানুষের কল্পনায় পশুমূর্তিধারী সব দেবতার উপরেই মানবীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমে ক্রমে আরোপিত হতে লাগলো: উদ্ভব হল পশু ও মানুষের সমন্বয় মূর্তির। ...সংশ্লিষ্ট প্রাণীটি সে মানব দেহধারী দেবতার সহচর কিংবা বাহন হিসেবে গণ্য হতে থাকল তখন থেকেই। আর এই বিশেষ দেবতার প্রতীকসূচক বলেও সেই নির্দিষ্ট প্রাণীটি চিহ্নিত হয়ে গেল।[১]

ভারতে অতীতকাল থেকেই বাঘের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জদোড়া প্রাপ্ত থেকে একটি শীলমোহরে যে শিবমূর্তি উদ্ধার করা হয় সেখানে শিবের সঙ্গে চারটি জীবজন্তুর মধ্যে একটি বাঘ।[২] সম্ভবত অতীতকালে দেবাদিদেবের বাহন ছিল বাঘ। কিন্তু আর্য আগমনের সূত্রে কৃষি সভ্যতার বিকাশের ফলে গরু পূজা আরম্ভ হলে শিবের বাহন হিসাবে বাঘের

স্থলাভিষিক্ত হয় ষাঁড়। যদিও বাঘের সঙ্গে মহাদেবের অতীতের সম্পর্কের কারণে শিবের বসন ও আসন হিসাবে বাঘ ছালের ব্যবহার থেকে যায়। শিবের ধ্যান মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্লোনাজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম।।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম।।"

অর্থাৎ রজতগিরির ন্যায় শুভ্রজ্জ্বলকান্তি শিবকে ধ্যান করি, মনোহর চন্দ্রকলা তাঁর ললাট ভূষণ, রত্নময় ভূষণে তাঁর দেহ সমুজ্জ্বল। তদীয় বাম হস্তদ্বয়ে পরশু ও মৃগ মুদ্রা; দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা। তিনি ব্যাঘ্রচম্ম পরিধান পূর্বক পদ্মাসনে প্রসন্নভাবে সমাসীন। দেবগন চতুর্দিক হতে তার স্তুতি করেছেন। তিনি বিশ্বের আদি এবং মূল কারণ এবং নিখিল ভয়নাশক ।তিনি পঞ্চ আনন বিশিষ্ট এবং তাঁর প্রতি আননে তিন তিনটি নয়ন।[৩]

তিনি পশুরক্ষক দেবতা বলে তাঁর আরেক নাম পশুপতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাঠমান্ডুতে অবস্থিত নেপালের জাতীয় মন্দিরটি পশুপতিনাথের মন্দির নামেই খ্যাত। নেপালে 'ব্যাঘ্র ভৈরব' নামে এক সম্প্রদায় বাঘযাত্রা উপলক্ষে বাঘের মুখোশ পরে পূজা এবং নাচ করে থাকে। রাজপুতনাতে 'বাঘেল রাজপুত' নামে প্রাচীন উপজাতি রয়েছে, যারা বাঘের উপাসনা করে থাকে।[৪] মধ্য ভারতেও বাঘের পূজা করে এমন এক উপজাতির দেখা পাওয়া যায়। এঁরা কখনও বাঘ শিকার করে না বা বাঘ শিকার করতে কাউকে সাহায্য করে না। উপরন্তু কারো দ্বারা ফাঁদ পেতে বাঘ শিকারের চেষ্টার কথা জানতে পারলে তাঁরা দল বেঁধে রাত্রিতে বনে গিয়ে বাঘের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলে- তাঁরা ফাঁদ পাতেনি কিংবা ফাঁদ পাতার কাজে কোন রকম সাহায্য করেনি।[৫] উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে বাঘের দেবতার নাম বাঘেশ্বর। ছোটনাগপুরে সাঁওতালদের মধ্যেও বাঘের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারে 'কিষান' উপজাতির মানুষেরা বনরাজা নামে এক বাঘের দেবতার পূজা করে থাকে। মধ্যপ্রদেশে কুর্কু উপজাতির মানুষেরা বাঘদেও নামে এক বাঘের দেবতার পূজো করে থাকে। এই বাঘ দেবতার পূজকদের বলা হয় 'ভোমকা'। যদি কখনও বাঘ গ্রামে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতি সাধন করে তখন এই 'ভোমকা'রা বাঘদেও-এর উদ্দ্যেশ্যে বিশেষ পূজা করে থাকে।দাক্ষিণাত্য জুড়েও বাঘের পূজা প্রচলিত রয়েছে। ত্রিচিনা পল্লীতে একটি বাঘের উপর তিনটি পুরুষ উপবিষ্ট মূর্তি দেখা যায়,যা আসলে ওই এলাকায় প্রাচীনকালে বাঘের পূজার অস্তিত্বকে স্বীকার করে।[৬] এইসব নিদর্শন প্রমাণ করে অরণ্যে বা অরণ্য সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী জনজাতিগুলোর মধ্যে বাঘের পুজোর প্রচলন ছিল।

অরণ্যবেষ্টিত বঙ্গদেশের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সুন্দরবনের উপস্থিতি। বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তৃত এলাকা নিয়ে সুন্দরবন। চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে এই এলাকাকে বাঘ-কুমীর-ডাকাত উপদ্রুত এলাকা হিসাবেই বর্ণনা করেছেন -

"কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পালায়।
জলে পড়িলে যে বোল কুম্ভীরেই খায়।।
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে।।"[৭]

সুকুমার সেনের অনুমান বাংলায় আর্য আগমনের পূর্বে অস্ট্রিক,মঙ্গল দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্যরা বাস করিত। অস্ট্রিক মঙ্গল জাতির লোকেরা একপ্রকার ব্যাঘ্র মানব দেবতার পূজা করতেন। মহাযান তান্ত্রিক দেবী মঞ্জুমীর বাহন ছিল বাঘ। লোকনাথ দাসের 'সীতা চরিত্র' গ্রন্থে এক ফকিরকেও বাঘের পিঠে চড়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

নদীর ধারে বাস/ভাবনা বারো মাস। এই ছিল সুন্দরবন তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত মানুষের জীবনের সারসত্য। ফলে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি এ কেবল কবির কথা নয়, এই এলাকায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের কথা। আর এই জীবন সংগ্রামের পথে পদে পদে রয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি দিতে আবির্ভূত

হন- দক্ষিণ রায়, কালু রায়, রূপরায়,দুখের মা, বনবিবি, নারায়নী ,সোনারায়, ভান্ডানি,বড়গাজি খা,শালপীন পীর,মোবারক গাছা বাঘুত, বাঘরায়চন্ডী, মালঞ্চবুড়ি, বাঘসুর, কালসুর, ডাংধরা প্রভৃতি দেবদেবীরা।

দক্ষিণ রায় কে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম- রায়মঙ্গল। কৃষ্ণরাম দাস, হরিদেব, রুদ্রদেব- এই তিনজন কবির রায়মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। যদিও কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কাব্যের শুরুতেই মাধব আচার্য নামে এক কবির রচিত রায়মঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করেছেন কিন্তু সে কাব্য সেকালেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কবি কৃষ্ণরাম দাস-ই এই ধারার আদি কবি।

কবি কৃষ্ণরাম দাস কথক ঠাকুরের ভঙ্গিতে রায়মঙ্গল কাব্য রচনার ইতিহাস বর্ণনা করে কাব্য রচনা শুরু করেছেন। কবি ভাদ্র মাসের সোমবারে খাসপুর পরগণার বড়িষ্যা গ্রামে গিয়ে যখন রাত্রিযাপন করেছিলেন তখন দক্ষিণ রায়ের স্বপ্নাদেশ পান।

"রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহন এক মহাজন।।
করে ধনুঃশর চারু সে মহাকার।
পরিচয় দিলা মোর দক্ষিণের রায়।।"[৮]

এরপর মহাকায়-মহাজন দক্ষিণের রায় স্বয়ং কবি কৃষ্ণরাম দাসকে মাহাত্ম্য প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বললেন – 'তোমার কাব্যকে অগ্রাহ্য করার শক্তি বা দুরবুদ্ধি কারও হবে না'। -

"পাচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটির মাঝে হইব প্রচার।।
পূর্বে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইলো ভাষা।।
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত ফিরাইয়া গায় জাগরণ।।
যাকুটীনাকুটী আর করে রঙ্গী ভঙ্গী।
পরম কৌতুক শুনে মউল্যা জলঙ্গী।।
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সংবশে তাহারে তবে সংহারিরা বাঘে।।"[৯]

এসব শুনে কবি কৃষ্ণরাম দাস স্বপ্নঘোরের মধ্যেই সবিনয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন। কারণ দক্ষিণ রায় সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই–

"তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু।
কেমনে কবির গীত আমি অতি শিশু।।"[১০]

অতএব দক্ষিণ রায় কবিকে কাহিনির সারাৎসার জানিয়ে দিলেন-

"হেলা না করিও তবে পাইবা সকলি।
তুমি যে করিবা গীত শুন তাহা বলি।।
মুনি মুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর।।
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নব রাজ্য কাটিয়া কানন।।
... ...
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।

এতেক বলিয়া রায় গেল নিজস্থল।।"[১১]

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যের পুথিটিও অসম্পূর্ণ। যে পুথিটি পাওয়া গিয়েছে তাতে 'নৃপতি প্রভাকর' প্রসঙ্গ, 'পাটনে পূজা' গ্রহণ, হিজলীর কাহিনি অনুপস্থিত। কবি তাঁর কাব্যে মূলত দেবদত্ত - পুষ্প দত্ত কাহিনী সহ দক্ষিণ রায় - বড় খাঁ গাজীর বিরোধ ও সন্ধির কথা বর্ণনা করেছেন।

পুষ্পদত্ত সাধু বাণিজ্য যাত্রা করবেন। এজন্য প্রয়োজন সমুদ্রগামী ডিঙ্গি নৌকা। সেই নৌকা নির্মাণের জন্য কাঠ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হল রতাই বাউল্যাকে। কাঠ সংগ্রহের জন্য রতাই তার ছয় ভাই এবং একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবন গেল। সেখানে প্রচুর পরিমাণে কিরাপা, পশুরি এবং সুন্দরী গাছের কাঠ সংগ্রহ করা হল কিন্তু ভুলবশত বনের মধ্যে থাকা দক্ষিণ রায়ের গাছ কেটে ফেলার জন্য দক্ষিণরায় তাঁর ছ'টি বিশ্বস্ত বাঘ-মামুদা, কুমদা, সুসুদা, টঙ্গ ভাঙ্গা, বজ্রদন্ত খান ও দাউড়া চক্ষুকে পাঠিয়ে রতাই এর ছয় ভাইকে বধ করেন। এমতাবস্থায় যখন রতাই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই দৈববাণী শুনতে পায় -

"আমি দক্ষিণের রায় সর্ব্বলোকে গুনগায়
আঠারো ভাটিতে পূজে সবে।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে।।"[১২]

রতাই নিষ্ঠাভরে পুত্র বলিদান দিয়ে দক্ষিণ রায়ের পূজা করলে দক্ষিণ রায়ের কৃপায় পুত্র এবং ছয়ভাইদের প্রাণ ফিরে পান। এরপর সকলেই দক্ষিণ রায়ের জয়গান করতে করতে প্রচুর কাঠ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। কাঠ পেয়ে শুরু হল ডিঙ্গি নির্মাণ। ভগবানের নির্দেশে বিশ্বকর্মা, হনুমান এবং সুদক্ষ কারিগরেরা সাতটি ডিঙ্গি নির্মাণ করলে সুসজ্জিত ডিঙিগুলি দেখে মহা খুশি হলেন বণিক পুষ্প দত্ত। পুত্রের যাত্রার মঙ্গল কামনায় পুষ্প দত্তের মা সুশীলা দক্ষিণ রায়ের পূজা করলে দক্ষিণ রায় প্রীত হয়ে বিঘ্ননাশক একটি প্রসাদে ফুল দিয়ে দৈববাণী করলেন -

"যতনে পাশেতে রাখ না ভাবিয়া আন।
রামের কবচ নহে ইহার সমান।।"[১৩]

মা সেই রক্ষাকবচ পুত্রের হাতে তুলে দিলে সপ্তডিঙ্গি সাজিয়ে, দক্ষিণ রায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে পুষ্প দত্ত বড়দহ থেকে তুরঙ্গ পাঠনের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

বহু স্থান অতিক্রম করে সপ্ততরী খনিয়ায় এসে পৌঁছালে পুষ্প দত্তের অনুরোধে প্রধান কর্ণধার তাকে দক্ষিণরায় ও গাজীর সংঘর্ষ এবং ভগবানের মধ্যস্থতায় সন্ধির কাহিনি শোনালেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, সমস্ত ভাটি অঞ্চলে আধিপত্য থাকবে দক্ষিণ রায়ের, হিজলী'র অধীশ্বর কালু রায় আর বড় খাঁ গাজী সর্বত্র পূজিত হবেন। এই কাহিনী শোনার পর সকলে দক্ষিণ রায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। নানা দহ, নানা জায়গা অতিক্রম করে সাধু, রাজদহে উপস্থিত হয়ে দক্ষিণ রায়ের মায়াজালে সমুদ্রের মাঝে এক অপূর্ব মায়াপুরী দেখতে পেলেন। সেই অপূর্ব মায়াপুরী নগরী পেরিয়ে অবশেষে পুষ্প দত্ত বাণিজ্য নগরী তুরঙ্গ পাটনে পৌঁছালে রাজা সুরথ যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। কুশল বিনিময়ের পর নিজের যাত্রা বৃত্তান্ত বর্ণনার সময় পুষ্প দত্ত সমুদ্রের মাঝে পুরী নগরী দেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে রাজা সুরথ পুনরায় সেই দৃশ্য দেখাতে আদেশ দেন। কিন্তু পুষ্প দত্ত সেই দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ হলে ক্ষুব্ধ রাজা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তখন এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পুষ্প দত্ত দক্ষিণ রায়ের উদ্দেশ্যে চৌতিশা স্তব পাঠ করে। সেই স্তবপাঠে তুষ্ট হয়ে দক্ষিণ রায় রাজা সুরথের বিরুদ্ধে বিশাল ব্যাঘ্রবাহিনী পাঠালে রাজ সৈন্যরা পরাজিত হয়। স্বয়ং দক্ষিণ রায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে রাজা সুরথ কে পরাজিত এবং নিহত করেন। রাজাকে হারিয়ে শোকাহত রানী কান্নাকাটি শুরু করলে দক্ষিণ রায়ের কৃপায় রাজা এবং রাজ সৈন্যদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন।

দক্ষিণ রায়ের নির্দেশে রাজা সুরত পুষ্প দত্তকে কারাগার মুক্তি পেয়েই পুষ্প দত্ত পিতার অনুসন্ধান শুরু করে। কারাগারের মধ্যেই সাক্ষাৎ হয় পিতা দেবদত্তের সঙ্গে। পিতা পুত্রের আসল পরিচয় জানতে পেরে রাজা সুরথ খুশি মনে

নিজের মেয়ে সঙ্গে পুষ্প দত্তের বিয়ে দেন। তারপর পুষ্প দত্ত পিতা এবং স্ত্রীকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে মাতা সুশীলা আল আহ্লাদিত হয়ে বরণ করে ঘরে তোলে। অবশেষে পুষ্প দত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে তার যাত্রা বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে রাজা মদন অত্যন্ত খুশি হয়ে মহা ধুমধাম করে দক্ষিণ রায়ের পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকেই আঠারোভাটি অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রচারিত হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। বাঘের দেবতা হিসেবে দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রচারিত হলেও কালক্রমে সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষক, কাঠুরে, মধু আহরনকারী মৌল, মাঝি মল্লা সকলেরই রক্ষাকর্তা এবং আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলেন দক্ষিণ রায়।

তথ্যসূত্র :

১. পূজা পার্বণের উৎসকথা, পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, জুলাই ১৯৫৯, পৃ. ১৩
২. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য,কলিকাতা বুক হাউস ,১৩৪৬ ব., পৃ. ৫০৫
৩. উইকিপিডিয়া
৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬ ব. পৃ. ৫০৬
৫. ঐ, পৃ. ৫০৬
৬. ঐ, পৃ. ৫০৬
৭. শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, সম্পা. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ,১৯৯৫, পৃ. ৩১০
৮. কবি কৃষ্ণ রামের গ্রন্থাবলী, সম্পা. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ. ১৬৬
৯. ঐ, পৃ. ১৬৭
১০. ঐ, পৃ. ১৬৭
১১. ঐ, পৃ. ১৬৭-৬৮
১২. ঐ, পৃ. ১৭১
১৩. ঐ, পৃ. ১৭৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল, সম্পা. সুভাষ মিস্ত্রী পুস্তক বিপণি, ২০২১
২. বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, কলকাতা, ১৯৬৬
৩. চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,ডঃ দেবব্রত নস্কর, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯
৪. লৌকিক দেব-দেবী নৈবদ্য পূজাচার, দীপঙ্কর দাস, প্রতিভাস, ২০১৯